কেউ বলে ফকির লালন, কেউ বলে লালন সাহঁ, আবার কেউ বলে মহাত্মা লালন। তিনি একজন অধ্যাত্মিক বাউল সাধক, মানবদাবাদী, সমাজ সংস্কারক, দার্শনিক। তিনি অসংখ্য গানের গীতিকার , সুরকার ও গায়ক ছিলেন। আত্মতত্ব, দেহতত্ত্ব, গুরু শীর্ষ , প্রেম ভক্তি, সাধনতত্ত্ব, মানুষ-পরমতত্ত্ব, আল্লাহ-নবী, কৃষ্ণ-ভগবান সহ বিভিন্ন বিষয়ে তিনিঁ গান করেছেন। যে জগতের সুর সতের শতকের সুষ্টি হলেও তার মুর্ছনায় আজো মন ভেসে যায়। আর তিনিই হলেন বাউল গানের অগ্রদূত '**ফকির লালন**'।

জম্ম ও জীবনঃ

লালন শাহ অবিভক্ত বাংলার কুষ্টিয়ার কুমার খালী থানার চাপড়া ইউনিয়নের অন্তর্গত ভাড়ারা গ্রামে ১৭৭৪ সালে জম্ম গ্রহন করেন। তিনি ধর্ম,বর্ণ ,গোত্র, জাত এর বিভেদ থেকে সরে এসে মানবতার জয়গান করেছেন। তারঁ শিল্পকর্ম বাউল ভাবধারা অন্তকরণে লালিত হয়ে এখন আধুনিক যুগেও গবেষণার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে।

লালনশাহ ঘটনাক্রমে মলম শাহ ও তার স্ত্রী মতিজান এর পালিত পুত্র হিসেবে বাউল তত্ত্বের দীক্ষা গ্রহন করেন। গুটি বসন্তে তিনি একটি চোখ হারান। এরপর ছেউড়িয়াতে শিষ্যদের নিয়ে বসে শুরু করেন লালন। সেখানেই তিনিঁ দার্শনিক, গায়ক সিরাজ সাইঁজির সংস্পর্শে তারঁ দ্বারা প্রভাবিত হন।

লালনের পারিবরিক জীবন সম্পর্কে বিস্তারিত তেমন তথ্য পাওয়া যায় না। তার সবচেয়ে অবিকৃত তথ্যসূত্র তরি নিজের রচিত অসংখ্য গান। তার বিস্তর তথ্য উপস্থাপন করা সম্ভব না হলেও তারঁ কয়েকটি গানে তিনিঁ নিজেকে ''লালন ফকির" হিসেনে আখ্যায়িত করেছেন। তার মুত্যুর পর কুষ্টিয়া থেকে প্রকাশিত 'হিতকরী " পত্রিকার সম্পাদকীয়তে উল্লেখ করা হয়, '' ইহার জীবনী লিখিবার কোন উপকরণ পাওয়া কঠিন। নিজে কিছু বলিতেন না। শিষ্যরা তাহার নিষেধক্রমে বা অজ্ঞতাবশতঃ কিছুই বলিতে পারে না।"

ধর্ম বিশ্বাসঃ

লালনের ধর্ম বিশ্বাস নিয়ে যথেষ্ঠ মতভেদ রয়েছে। লালন মানবতাকে সবার উপরে স্থান দিয়েছিলেন। লালন তার প্রথম জীবনী রচয়িতা বসন্ত কুমার পাল বলেছেন – ‘‘সাইজিঁ হিন্দু কি মুসলমান, এ কথা আমিও স্থির বলিতে অক্ষম”। লালনের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা না থাকলেও সাধনাবলে তিনি হিন্দুধর্ম এবং ইসলামধর্ম উভয় শাস্ত্র সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেন। সকল ধর্মের লোকের সাথেই তার ভালো সম্পর্ক ছিলো।

বাউলদের ধর্ম-সাধনায় গুরুত্বের সাথে বিবেচ্য ‘ সহজিয়া” পন্থা বা সহজ পন্থা। ‘সহজিয়া সাধনার মূল কথা হলো ‘উজান-সাধনা’। এদের পথ বিপরীতমুখী, উজানের মতো নয়। ভোগ বিলাসিতা ইন্দ্রিয়সুখের গড্ডালিকায় এরা আবতির্ত নয়। রূপ থেকে অরূপে পৌছাবার নিরন্তর সাধনা।

বাউল দর্শনঃ

বাউল একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়। এটি বিশেষ সম্প্রদায়ের লোকাঁচার। সতের-আঠার শতকে বাংলায় এ সম্প্রদায়ের অভ্যদয় হয় যা এখনো জনপ্রিয়। বাউলরা আধ্যাত্ব সাধনা, পরমাত্মার অন্বেষণ করে। তারা বিশ্বাস করে আত্মাকে জানলেই পরমাত্মা বা সৃষ্টকর্তাকে জানা সম্ভব। আত্মার বাস দেহে , তাই বাউলা দেহকে পবিত্র মানে করে। ইউনেস্কো ২০০৫ সালে বাউল গানকে বিশ্বের মৌখিক এবং দৃশ্যমান ঐতিহাসিকসমূহের মাঝে অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ হিসেবে ঘোষণা করে।

লালনের আখড়াঃ

লালন কুষ্টিয়ার কুমার খালি উপজেলার ছেউড়িয়াতে একটি আখড়া তৈরি করেন, যা এখনো বিদ্যমান রয়েছে। যেখানে তিনি তার শিষ্যদের নীতি ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা দিতেন। তার শিষ্যরা তাকে ‘‘শাইঁ” বলে ডাকতো। তিনি প্রতি শীতে আখড়ায় মহোৎসব আয়োজন করতেন যা এখনো চলমান। তার জন্ম ও তিরোধান দিবসে স্মরণোৎসব করা হয়।

লালন ও দেহতত্ত্বঃ

মানুষই সর্বোচ্চ আসনের আসীন। তার বহ গানে মনের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি বলেন সকল মানুষের মাঝে ঈশ্বর বাস করেন যা আত্মা হিসেবে মানব পিঞ্জরে নিত্য যাওয়া আসা করে। যা কোন বাধা মানে না। লালন ভক্ত বাউলরা মানেন দেহের মধ্যে স্থির রয়েছে বিশ্বের সবকিছু , শুধু তা চিনতে হবে।

বৌদ্ধতান্ত্রিক ও সহজিয়াদের মতে, সকল সত্য আমাদের ভিতরে , শুধু অন্তরে নয়, আমাদের দেহের ভিতরেও। যে সত্য বিরাজিত বিশ্ব ব্রক্ষান্ডের বিপুল প্রবাহের ভিতরে, সেই সত্যই বিরাজিত আমাদের দেহের ভিতরে-সমস্ত জৈবিক প্রবাহরে ভিতরে। এই দেহের ভিতরেই রয়েছে চন্দ্র, সূর্য , গ্রহ, নক্ষত্র , পাহাড় পর্বত, নদ,নদী , বৎসর, মাস, ুদিবস, তিথিক্ষণ। এই দেহেই সত্যের মন্দির , সকল তত্ত্বের বাহন”। তই বলা হয়েছে: ‘‘ যা আছে ভান্ডে, তা আছে ব্রক্ষান্ডে।”

লালনের গানঃ

ফকির লালনের গান লালনসংগীত নামে পরিচিত। লালন মুখে মুখে গান রচনা করতেন এবং সুর করে পরিবেশন করেতেন। তার শিষ্যরা তাঁর গান লিখে রাখতো। লালন তার গানে সমকালীন সমাজের নানান কুসংস্কার, সাম্প্রদায়িকতা, সামজিক বিভেদ,বৈষম্য ইত্যাদির বিরুদ্ধে বিভিন্ন প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। এছাড়া তার গানে তিনি রূপকের আড়ালে তার নানা দর্শন ও প্রশ্নের উত্তর উপস্থাপন করেছেন।

লালন উৎসবঃ

লালন শাইঁয়ের বেচেঁ থাকাকালীন বিভিন্ন উৎসবের আয়োজন করা হতো। বিশেষত শীতকারে একটি উৎসবের আয়োজন কাতেন। সেখানে আসকারে আলোচনা ও গান হতো। বর্তমানে তার মৃত্যু দিবসে আখড়ায় স্মরণোৎসব পালন করা হয় যেখানে দেশ

বিদেশের অনেক লোক অংশগ্রহণ করে। ২০১০ সাল থেকে এখানে পাঁচ দিন ব্যাপী উৎসব হচ্ছে। এই অনুষ্ঠানিটি ‘লালন উৎসব’ হিসেবে পরিচিত।

<u>বিশ্ব সাহিত্যে প্রভাবঃ</u>

লালন ছিলেন একজন মহান দার্শনিক। তার গান ও দর্শনের দ্বার অনেক বিশ্ববিখ্যাত কবি, সাহিত্যক,দার্শনিকরা ও প্রবাহিত হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ লালনের মৃত্যুর দুই বছর পর তার আখড়া বড়িতে যান এবং তার দর্শনে প্রবাহিত হয়ে ১৫০ টি গান রচনা করনে। সাম্যবাদী কবি কাজী নজরুল ইসলাম এবং আমেরিকান করি এলেন গিন্সবার্গ লালনের দর্শনে প্রভাবিত হন। তার রচনাবলীতে লালনের দর্শনের অবতারনা করেন। ১৯৬৩ সালে ছেউড়িয়ার আখড়াবড়িতে লালন লোকসাহিত্য কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয় , যা পরে বিলুপ্ত করে ১৯৭৮ সালে শিল্প কলা একাডেমির অধীনে ‘‘লালন একাডেমী” প্রতিষ্ঠিত হয়।

<u>তিরোধানঃ</u>

১৮৯০ সালের ১৭ অক্টোবর লালন ১১৬ বছর বয়সে নিজ আখড়ায় মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর দিন ভোর ৫ টা পর্যন্ত গান বাজনা করেন এবং এক সময় তার শিষ্যদের বলেন- ‘আমি চলিলাম’ এবং কিছু সময়ের মধ্যে তার মৃত্যু হয়। তার ইচ্ছা অনুযায়ী ছেউড়িয়ায় তার আখড়ার মধ্যে একটি ঘরের ভিতর তাকে সমাধি করা হয়।